শূন্যবৃত্ত

আবদুন্ নূর

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং

১১৪ মতিঝিল বা/এ

পোস্ট বক্স ২৬১১

ঢাকা ১০০০

বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ১৯৯০

গ্রন্থস্বত্ব : সেবী (বাংলাদেশে কর্মরত উত্তর আমেরিকার একটি সমাজসেবী সংগঠন)

প্রচ্ছদ

আমানউল্লাহ

প্রবাসী বাঙালীর জীবনকেন্দ্রিক এই উপন্যাসের চরিত্র, স্থান এবং কাল সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

Shunnay Britta (aa novel) by Abdun Noor published by The University Press Limited, Post Box 2611, Dhaka, Bangladesh.

প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১১৪ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০। মুদ্রাকর: বর্ণমিছিল ৪২ক, কাজী আবদুর রউফ রোড, ঢাকা ১১০০।

উৎসর্গ

নাজমা নূরকে

পটোম্যাক। মেরীল্যাণ্ড।

ওয়াশিংটনের পাশে পটোম্যাক নদী। সেই নদীর পাশেই পটোম্যাক শহর। সেখানে এক বাড়িতে মধ্যরাত্রির আসর উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

নয়। আট। সাত। খুরশীদ ইমতিয়াজের সেকেণ্ড গোনা শুরু হয়েছে। উচ্চকিত সাবলীল কন্ঠ। উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে পঞ্চাশ জোড়া নারী পুরুষ। নতুন বছরের আগমন প্রতীক্ষায়। ওরা পুরোনো বছরকে শুধু পিছু ঠেলে বিদায় দিতে চাইছে না। চাইছে ছিটকে ঝেড়ে ফেলে দিতে। ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে বঞ্চনা, হতাশা ও বেদনা।

আপনাদের সঙ্গীদের পাশে নিয়ে আসুন। কাছে টানুন। ঘন হয়ে আসুন। এবং অপেক্ষা করুন। খুরশীদ ইমতিয়াজের গলা আরো দরাজ হয়ে ওঠে। and wait for the new year to come. ছয়, পাঁচ চার।

ডিসকো বাতিটা জ্বলে ওঠে। থরথর করে কাঁপা রে গুলো হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যায়। সবুজ নীল হলদে আলোর রেখাগুলো শক্ত ছুরির ফলার মতো ঝলসে ওঠে। সারা বছরের জমে থাকা হতাশাগুলো সারি সারি ছুরি হয়ে তীক্ষ্ণ ঘায়ে পুরোনো বছরকে মেরে ফেলার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

Kiss your partners. It’s the happy new year - খুরশীদ ইমতিয়াজ গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে ওফেঠ। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয় জমায়েত নারী পুরুষ। সমস্বরে।

Happy new year.

That’s the new year.

Our new year.

Our great new year. অনেকগুলো কন্ঠ একসঙ্গে রা রা করে ওঠে। সাড়া পড়ে যায়। খুরশীদ তখনো ওর দোর্দণ্ড শাসন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্ষমতার প্রতিভু যেন! মনে হয় এ পার্টির প্রতিটি প্রাণী যেন তার প্রজা। আর সে সম্রাট! সময়, প্রাণ আর ঘটনা সব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওঁর নির্দেশ শুনতে। ওরা সব আজ খুরশীদ ইমতিয়াজের আয়ত্তে। ওরা বিনা দ্বিধায় আজ সন্ধ্যায়

খুরশীদের প্রতিটি ইচ্ছাকে মেনে নেবে।

Now you can kiss your partners. And drink to their health. And of course with champagne. খুরশীদ ইমতিয়াজ আদেশ দেয়। কোলাহল সামান্য স্তব্ধ হয়ে আবার বেড়ে ওঠে।

কেউ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। কেউ হাত বাড়ায়। কেউ সশব্দে চুমু খায়। উত্তাল হয়ে উঠেছে প্রাণগুলো। সতেজ মন। নতুন বছর নিয়ে আসবে ওদের জন্য ক্ষমতা, মমতা, উজ্জ্বলতা। প্রাণময় হবে সুন্দর জীবনগুলো।

দশ মিনিটের জন্য ডিসকো নাচের বিরতি হচ্ছে। খুরশীদের আদেশ প্রবল হয়ে ওঠে। বাংলা থেকে আবার ইংরেজীতে ফিরে যায়। ইংরেজী নববর্ষের আগমন ইংরেজীতেই ভালো জানান দেয়া যায়।

Let us meet. And meet. And meet. And wish each other the best of the new year. কথার নেশায় যেন পেয়েছে খুরশীদ ইমতিয়াজকে। সব ক্লান্তি, সব দ্বিধা, সব সংশয়কে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আসুন আমরা বরণ করে নিই নতুন বছরকে, নতুন জীবনকে। ইমতিয়াজ বলেই চলেছে। ওর কথা থামানোর যেন কোন ইচ্ছা নেই।

Long live the new year - চিৎকার করে ওঠে আহমেদ নজীর। গলায় তরলতা, অনেকখানি টেনেছে সে আজ।

Long live our lives. সায় দিয়ে ওঠে সঞ্জরী সাবেত। গলা তুলে লম্বা সুডৌল হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাসটা উঁচু করে ধরে। স্বল্প আলোয় ওর গলায় ঝুলোন একনরী মুক্তোর মালা জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকে।

জনতা চেঁচিয়ে ওঠে সঞ্জরীর সাথে তাল মিলিয়ে। Long live our lives. ঝলসে ওঠা ডিসকোর আলাগুলোয় ঝলমল করছে, তরলিত হয়েছে অনেকগুলো সুখী মন।

Long live our big brother, Khurshid Imtiaj. হেঁকে ওঠে ওপাশ থেকে সঞ্জরী। একটু থমকে যায় পার্টি। বড়ো ভাই, ইরম নৎড়ঃযবৎ কথাটার অর্থ কি অন্য? আজ সন্ধ্যায় সেটা জেনে কি হবে? প্রয়োজন কি সেই নিগূঢ়

অর্থ জানার। বরং সাড়া দেয়া যাক নতুন বছরের নতুন নেতাকে। অল্প সময়ের জন্যে হলেও। সজোরে উঠে যায় একশ' হাত ওপরে। শ্যাম্পেন নিয়ে গলার সব রগ ফাটিয়ে সজোরে রব ওঠে:

Long live our new brother, big brother, Khurshid Imtiaj. Long live our big brother, Khurshid Imtiaj. মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে যায় ইমতিয়াজ। পরে সম্বিত ফিরে আসে। বিজয়ীর হাসি ধীরে ধীরে ঠোঁটে ভেসে ওঠে। অবশেষে সাফল্য এসেছে এতোদিন পরে। জয়ী হয়েছে সে। স্বীকৃতি মিলেছে। মেট্রোপলিটান ওয়াশিংটনের বাঙালী সমাজের স্বীকৃতি। আজ সে নেতা বনেছে।

তখন জনতা একটানা চিৎকার করে চলেছে। তাল দিয়ে, ল্যাটিন মিউজিকের সুরে সুরে, নৃত্যরত দেহের রিদম মিলিয়ে,

Long live our big brother Khurshid Imtiaj.

নসরত ইমতিয়াজ ধীর পায়ে এগিয়ে আসে। ইমতিয়াজ তখনো উঁচু ষ্টলে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। নসরত আস্তে আস্তে ওর কাছে এসে দাঁড়ায়। একটু উঁচু হয়ে আলতো পরশে চুমু দেয় খুরশীদকে। কিন্তু খুরশীদ জড়িয়ে ধরে না, মাথা নিচু করে না, শুধু বাঁ হাতটা দিয়ে একটু কাছে টেনে নেয়। আলতো করে আদর করে। আর মন্দ্রিত মনে শুনতে থাকে ক্ষমতার সেই আশ্চর্য গুঞ্জরণ। বিগ্ ব্রাদার। বিগ ব্রাদার। মধুময়। ক্ষমতা আর আনন্দের তরলতা খুরশীদের মনকে আপ্লুত করে।

সঞ্জরী সাবেত ধীরে জনতা থেকে সরে আসে। হাতে তখনো গ্লাস ধরা। শ্যাম্পেন ছলকে পড়ছে।

ভীষণ গরম। অসহ্য লাগছে। অথচ বাইরের হাওয়াটা মিষ্টি। উপরের সিঁড়ি বেয়ে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়াটা বেশ কিছুটা নিচে নেমে আসছে। হাওয়ার ফ্লো'র কাছে এসে দাঁড়ায় সঞ্জরী। আবার গ্লাসে চুমুক দেয়। মুখটা বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। ঠোঁট বাঁকায় সে। দূর ছাই! আজ শ্যাম্পেনের গ্লাসে কোনো স্বাদ নেই। সঞ্জরী নিজের মনে গজরায়। কোক মিশিয়ে নেবো নাকি? বা ভোদকা?

তিক্ততা তো বিদায় নেবে। শ্যাম্পেনের স্বাদ একেবারেই নেই আজ। বারের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে সঞ্জরী। বেশ দূরে। অথচ চারদিকে লোকজন সব গিজগিজ করে রয়েছে। ধাক্কা না দিয়ে, গা না ছুঁয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। গায়ে গায়ে লেপটে রয়েছে ছেলেমেয়েগুলো। জোড়ায় জোড়ায়। আরো বিরক্তি পায় সঞ্জরীর। এসব লোক দেখানো আদিখ্যেতা। সারা বছর ঝগড়া-বিবাদ করে কাটিয়ে, মাথা ফাটাফাটি করে এখন খুব গলা জড়াজড়ি করে চুমু খাচ্ছে। বাপের সুপুত্তুর সব। বউ অন্ত-প্রাণ সবার। নতুন বছরে বউয়ের লগ্নী হয়েছে সবাই। কেউ বউয়ের বগল ছাড়ছে না। তা যাও না বাবা তোমরা সবাই। নাচের ফ্লোরে গিয়ে বউয়ের হাত ধরে নাচ। নিজের মনেই বক বক করে সঞ্জরী। আমি একটু বারে যাওয়ার জায়গা পাই। তেতো শ্যাম্পেনের গ্লাসটা একটু ছুঁড়ে ফেলি।

একি সঞ্জরী, নাচছো না কেন? এসো এসো। আজমেরী তার স্বামীর হাতটা টেনে ড্যান্স ফ্লোরে নিয়ে যেতে যেতে ডাকে।

বেচারা আহমেদ নজীর পঞ্চাশে পৌঁছেছে বার্ধক্যের ক্লান্তি এসেছে অথচ অনুযোগ করেই ফেলে আজমেরী। অনেকক্ষণ তো রেস্ট নিয়ে নিয়েছো। এখন নাচতে এসো নজীর।

নজীর উল্টো বলে আজমেরীকে। সারাটা সন্ধ্যেই তো নেচেছো তুমি। এখন রেস্ট নাও।

নিমেষে আজমেরী কথা শোনায়। ওমা, বছরে সবাই মিলে নাচার সুযোগ এই একবারই আসে। যতো খুশি নেচে নেই। আবার তো পুরো বছর হাপিত্যেশ করে বসে থাকবো। এসো, এসো না গো। পরম সোহাগে নজীরের হাত ধরে টানে আজমেরী।

আহমদ নজীর আমতা আমতা করে বলে-দাঁড়াও, কথাটা কাদেরীয়া সাহেবের সঙ্গে শেষ করে নিই।

শুনে আজমেরী বেপরোয়া গলায় ধমকে ওঠে। রাখো, আরে রাখো। তোমার ব্যবসার হিসেব পরে হবে। এখন এসো আমার কাছে। আমরা দু'জন নাচবো।

একটু অপেক্ষা করো লক্ষ্মীটি। নজীর অনুরোধ করে। কাদেরীয়া অপেক্ষা করছে।

বিরক্তি চরম হয়ে ওঠে আজমেরীর। সোজা কাদেরীয়াকে লক্ষ্য করে বলে- কাদেরীয়া সাহেব, আপনি ভাই চিংড়ি মাছের দেনাগুপাওনার কথা কালকেই বলবেন। ওকে ছাড়ান দিন। এখন ও আসুক তো!

নজীর চাপা গলায় বলে, ছি ছি, বেশি টেনেছো নাকি তুমি আজমেরী? কাদেরীয়া সাহেব কি ভাবলেন বলো দেখি।

কি ভাবলেন? পাল্টা রুক্ষ গলায় ভ্রূকুটি তোলে আজমেরী।

ভাবলেন, আমার কোনো স্বাধীনতা নেই। কথা বলার অধিকার শুধু তোমার। নজীর জানায়।

না, নেই। একদম নেই। সটান সবাব দেয় আজমেরী। তুমি যতোক্ষণ আমার সঙ্গে থাকছো ততোক্ষণ তেমার স্বাধীনতা একদম নেই গো! পরম সোহাগে জড়িয়ে ধরে আজমেরী নজীরের গলা। ওর কাঁধে মাথা রেখে ডিসকোর তালে তালে নাচতে শুরু করে। ছন্দ মেলে না, পা মেলে না, কি আসে যায় তাতে! ছন্দে ভুল হলে, তালে ভুল হলেও ভারি ভালো লাগছে আজমেরীর। নিজের কাছে নিজেকে হারিয়ে ফেলা। সেটাই ওর মনের বড় সম্পদ। বড় আনন্দ।

নজীরের রাগ করতে ভারি ইচ্ছে হয় কিন্তু রাগ করতে পারে না। খুব অবুঝ, বড় বেঁচাল মেয়ে আজমেরী। গলায় ঝাঁজ হলে কি হবে, মনটা তার ভালো। ভীষণ নরোম। আশ্চর্য রোমান্টিক।

এসো এসো সঞ্জরী, আমাদের সঙ্গেই যোগ দাও। নজীরের কাঁধে মুখ রেখে মুগ্ধ দলায় আমন্ত্রণ করে আজমেরী, এমন রাতে না নেচে থেকো না, এসো।

না, না, সঞ্জরী, আমাদের সঙ্গে এসো। ওপাশ থেকে রুমারা আকবর বলে। জিজ্ঞেস করে স্বামীকে- তুমি নিশ্চয়ই মাইণ্ড করবে না?

না, না। জবাব দেয় শওকত আকবর। উঁচু গলায় বলে, এতো হবে আমাদের জন্যে আনন্দের অভিযাত্রা।

থাক, থাক, তোমার এতো কাব্যি করে বলতে হবে না। রুমারা নীচু গলায় ধমকে ওফেঠ। মুখ ফিরিয়ে ডাকে আবার, এসো না সঞ্জরী?

সঞ্জরী মাথা নাড়ে। পাশ কাটায়। ওদের কথা শুনতে পায়নি এমনি ভান করে। বারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। আর কয়েকজনকে পেরিয়ে গেলেই বার কাছে পাবে। শ্যাম্পেনের গ্লাসটা ফেলতেই হবে। একদম মুখে রুচছে না।

না বললে ভালো দেখায় না, সেজন্যই বললাম। রুমারা চাপা গলায় মন্তব্য করে, এমন সময়ে আমাদের মাঝে ওর না আসাই ভালো।

তুমিতো ভয়ানক ঈর্ষাকাতর। এবং কূটনীতিক মহিলা। শওকত অভিযোগ করে। মাছও ভাজলে, নিজের কুলও রাখলে।

আমার স্বভাবের ওপর এখন কথা বলোনা। পরের বারের জন্য ধরে রাখো। রুমারা ফিসফিসিয়ে বলে, আচ্ছা শোনো তো, বাজনাটা কিরকম বাজাচ্ছে বুঝতে পারছো? আমার স্টেপিংটা পিছলে যাচ্ছে। ঠাঁই পাচ্ছিনে।

জীবনে কখনো ঠাঁই পেলে না রুমারা, শওকত বলে, সঙ্গীতে পাবে কি করে? ওটা হচ্ছে বীচ বয়েজের বাজনা। বিটোফোন আর মোজার্টের ক্লাসিক্যাল সংমিশ্রণ করে ওটাতে ডিসকোর বিট দিয়েছে গীতিকার। না জেনেও ভীষণ সমঝদারের ভানে বলতে থাকে শওকত আকবর। বউকে ইম্প্রেস করার জন্যে। শোন, একটু কান দিয়ে শোনো।

কি জানি, ঠোঁট উল্টোয় রুমারা। বলে, আমি তো কিছুই বুঝছি না। আর শোনো, তুমি ওসব মোজার্ট আর বিটোফোনের কথা কাউকে শুনিয়োনা। কেউ বোঝে না। শুধু তোমার কথা শুনে হাসে।

হাসুক না, আমি থোড়াই কেয়ার করি, শওকত একটু গোঁয়ারের মতো বলে। সঙ্গীত বুঝতে হলে চর্চা করতে হয়, দু'একটা ফিল্মী রেকর্ড বাজালেই সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে যায় না। আমার মতো পড়াশোনা করতে হয়। জানতে হয়। বেশ তো তোমার বিজ্ঞতা তুমি নিজেই ধরে রাখো-খুব আদুরে গলায় বলে রুমারা। শুধু লোকজনকে বলো না। আমি দেখেছি, তুমি যখন কথা বলো, তখন ওরা মুখ টিপে টিপে হাসে, আমার সেটা ভালো লাগে না।

শওকতের কানে যেন রুমারার অনুযোগ যায় না। সে হঠাৎ বলে ওঠে-আরে দেখো দেখো, এখানে ফক্সট্রটের টিউন্টা শার্প টার্ণ করে ট্যাঙ্গোর দিকে নিয়ে গেছে। ভয়ানক চাল চেলেছে। শওকত আনন্দে প্রায় চীৎকার করে ওঠে। রুমারাকে সজোরে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে। শাদা বকের মতো লম্বা পা ফেলে ফেলে সারাটা ফ্লোর ল্যাটিন রিদমের মাঝে ট্যাঙ্গোর নাচের রব তুলে নাচতে থাকে শওকত আকবর। অসহায় দৃষ্টিতে বাধ্য রুমারা ওকে অনুসরণ করে।

বারের কাছে একেবারে যেতে পারছে না সঞ্জরী। বারে বারে থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে। গিজগিজে লোক। ধাক্কা দিয়ে যাওয়াটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে সঞ্জরীর পক্ষে। বেশি লোক ডাকা হয়ে গেছে।

সঞ্জরী নিজেই তো ডেকেছে। সামনের বছর আর ডাকবে না। ওর নিজের বাড়ির বেসমেন্টটা বড় বলে প্রতিবছর নিউ ইয়ার্সের পার্টিটা সঞ্জরীর বাড়িতেই হয়। বাঙালী কম্যুনিটি আয়োজন করে। সবাই মিলেমিশে। তবে সঞ্জরীর বাড়িতে পার্টিটা হয় বলে সে অফিসিয়াল হোস্ট। প্রধানা। সম্মানটা ভালোই লাগে সঞ্জরীর। বিশেষত খুরশীদ ইমতিয়াজ যখনই বলে-

সঞ্জরী, তোমাদের বাড়িতে পার্টি না হলে নিউ ইয়ার্সের পার্টি জমতেই চায় না। ইস্, কি যে বলেন খুরশীদ ভাই, আমাদের সবারই বেসমেন্ট আছে, সবগুলোই বড়। আপনার আছে, রুমারার আছে। সবগুলোই সুন্দর। সবখানেই পার্টি করা যায়। বেথেস্দায় পার্টির জায়গার অভাব আছে?

না না, তা নয়। খুরশীদ ইমতিয়াজ মাথা নাড়ে। তোমার মতো স্পেশাস নয়। এছাড়া তোমার বাড়ির মাধুর্যই আলাদা। অনেকে রিলাক্স করতে পারে, পার্টি জমে। আর তুমি এন্টারটেন করতেও জানো।

প্রশংসাটা সঞ্জরীর বেশ পছন্দ হয়ে আসে। গাল দুটো লজ্জায় তামাটে হয়ে ওঠে। তবু কপট বিনয়ে বলে। না খুরশীদ ভাই, আমি দেখেছি, সব বাড়িতেই সব পার্টিই জমে ভালো। আপনারা হাসি গানে আর কথায় পার্টি জমাতে ওস্তাদ। আর মদও গেলেন তেমনি, গ্যালন গ্যালন।

হো হো করে হেসে ওঠে খুরশীদ ইমতিয়াজ। খোলা হাসি। বলে-গরীব দেশের সিটিজেন আমরা। সারা দুনিয়া জানে মিস্কিনের দেশ। সে দুঃখ ভুলতে হলে আমাদের ড্রিংক করতে হয় সঞ্জরী। অজস্র ড্রিংকসের মাঝে না ভাসতে পারলে, আমরা যে দুঃখী, সে গ্লানি ভুলবো কি করে!

কি জানি খুরশীদ ভাই, আপনার দর্শনের কথাবার্তা আমি সবসময় বুঝতে পারি না, সঞ্জরী বলে।

পারো, আর না পারো, পার্টি কিন্তু এবারো তোমার বাড়িতেই হবে। খুরশীদ তার কথার জের ছাড়ে না। মনে নেই, গেলো বছর এবং তার আগের বছর শওকত সাহেবের বাড়িতে নিউ ইয়ার্সের পার্টি হয়েছিলো। একদম জমেনি। এবারে আমি তোমাকে ছাড়ছিই না।

আমি কি না করেছি খুরশীদ ভাই, কপট ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে সঞ্জরী। আপনাদের ইচ্ছা কি কখনো আমি ঠেলতে পারি। কখনো ঠেলেছি?

বেশ, খুরশীদ হুকুম দেয়, এবারের সব অ্যারেঞ্জমেন্ট গেলবারের মতোই হবে, আমি তোমাকে খবর দেবো।

খুরশীদ ওর সুবারবান কোটের বোতাম টিপতে টিপতে বলে, আমার এখন যেতে হবে, ইনভাইটি লিস্টটা বানাতেহবে, টেলিফোন করতে হবে। নসরতকে আগেই বলেছি। তুমি আর নসরত ভাগাভাগি করে দাওয়াতটা দিয়ে দেবে। আমি এখন যাই। এবারে কিন্তু বেশি সময় নেই অর্গানাইজ করার জন্যে।

খুরশীদ অ্যাশ রঙের টুপিটা মাথায় চড়িয়ে বেরিয়ে যায়। বাইরে গাড়ীর স্টার্টের আওয়াজ শুনতে পায় সঞ্জরী। ভীষণ ঠাণ্ডা, ডিজেলের ভোল্বো গাড়ীটা গরম করতে কিছুক্ষণ সময় লাগে। ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কোল্ড ওয়েভে দেশটা যেন ছেয়ে আছে। গাড়ি গরম করতে আরো কষ্ট হয়। তারপর হঠাৎ এক দমকা গরম হাওয়া ছড়িয়ে দিয়ে গাড়ীটা বেরিয়ে যায়।

একটা তৃপ্তির রেশ ফেলে সঞ্জরী। যাক্, নিশ্চিত হওয়া গেলো। নিউ ইয়ার্সের পার্টিটা এবারও তার বাড়িতেই হবে। খুরশীদ ইমতিয়াজ কথা দিয়েছে। এ পার্টিটা ওর বাড়িতে নিয়ে আসার জন্যে কতো কষ্টইনা করতে হয়েছে

সঞ্জরীকে। কলকাঠি নাড়তে হয়েছে। মেয়েলি পলিটিক্সে নাক গলাতে হয়েছে। খুরশীদ ভাই একটুও বুঝতে পারেনি, ভেবেছিলো এবারে সঞ্জরীর অমত ছিলো। সেজন্য সঞ্জরীর মত পেয়ে খুশি হলো, তৃপ্ত হলো। পুরুষের মনকে ঠিকই হ্যান্ডেল করতে জানে সঞ্জরী।

আগে কথা রটেছিলো নিউ ইয়ার্সে এবারে নাচ হবে না। জেনে সত্যিই বিস্মিত হয়েছে সঞ্জরী। এতোবড় একটা ট্রাডিশন নষ্ট হয়ে যাবে। পনেরো বিশ বছর ধরে হয়ে আসছে। এখন এককথায় সেই অনুষ্ঠান নষ্ট হয়ে যাবে! এতে বেশ আঘাত পেয়েছে সঞ্জরী তার ইগোতে। এতোগুলো পরিবারের প্রত্যাশা। সঞ্জরী প্রধান হোস্টেস। কতোবড় সম্মান। সেটা হঠাৎ করে ভেসে যাবে!

ডিসেম্বর আসতে না আসতেই অনুরোধ পেতে থাকে সঞ্জরী। অজস্র অনুরোধ- আমরা কি আসতে পারি আপনার পার্টিতে? আমাদের ভয়ানক ইচ্ছে। আপনার অনেক নাম শুনেছি। সঞ্জরী খুশিতে আপ্লুত হয়ে বলে-নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই আসবেন, আসবেন। একশ' বার আসবেন। আর পার্টি হয়ে যাবার পরে আরো টেলিফোন। টেলিফোনের পর টেলিফোন। অপূর্ব অপূর্ব, ওয়াশিংটকে কেউ পার্টি দিতে জানলে আপনিই দিতে জানেন, মিসেস সঞ্জরী এহসান সাবেত।

না, না, কি যে বলে! বিনয়ে নম্র হয়ে যেতে ভালো লাগে সঞ্জরীর। তবু টেলিফোনের মুখে কান লাগিয়ে রাখে। আশা করে আরো অনেক কমপ্লিমেন্ট। আরো অনেক মুগ্ধ কথা।

আর কি অপূর্ব সাজিয়ে রাখেন আপনার বাড়িঘর। প্রতিটি ছবি, প্রতিটি ডেকোরেশন পরিচ্ছন্ন, নিট্। সত্যিই শিল্পীমন আপনাদের। শিল্পী চোখ আপনাদের। শিল্পীহৃদয় আপনাদের।

মন দিয়ে সঞ্জরী শোনে আর নিজের মনেই বলে-না, আমিশিল্পী নই। আমি শুধু শিল্পীপ্রাণ। আমি শিল্পী প্রেমের, আর শিল্পী চোখের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিবছর রুটিনের মতো পেয়ে যাওয়া এসব কমপ্লিমেন্ট সারাবছর বাঁচিয়ে রাখে সঞ্জরীকে। সোমত্ত মেয়ের আঁচলে আগুন জড়ানো তপ্ততার মতো। আজ হঠাৎ কেউ সেটা ছিনিয়ে নেবে, নাচের পার্টি না করে, সঞ্জরীর সেটা ধারণার অতীত। সে জন্যেই তো কলকাঠি নাড়তে হলো। যাক্, সেও জয়ী। খুরশীদ

ইমতিয়াজ বলেছে-নাচ এবারও হবে নিউ ইয়ার্সে। এবং সঞ্জরীর বাড়িতেই।

অবশ্য নিউ ইয়ার্সের পার্টি ম্যানেজ করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। তারচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে বিশ পঁচিশজন কাপল্কে একসাথে ডিনার দেয়া। ওর নিজের বাড়িতে সে ডিনারে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের স্টাফ থাকে। এহসানের বিদেশী কলিগরা আসে। এ্যামবেসীর ডিপ্লোম্যাটরা আসে। ভয়েস অব আমেরিকার স্টাফও মাঝে মাঝে থাকে। তখন ভীষণ শঙ্কিত থাকে সঞ্জরী। কখন কি ভুল হয়ে যায়। তাই সব নিজেকেই দেখাশোনা করতে হয় সঞ্জরীর।

সে তুলনায় নিউ ইয়ার্সের পার্টি ডালভাত। পারতপক্ষে সঞ্জরীর তো কোনো দায়িত্বই নেই। ওর কাজ হচ্ছে শুধু খোলা দরোজায় দাঁড়িয়ে থেকে আমন্ত্রণ জানানো। স্মিত হাসা আর মাঝে মাঝে নিজের হাতে চা কফি বানিয়ে দেয়া। পরিবেশন করা ইচ্ছেমতো।

সাজানো গোছানোর পুরো ভারটাইতো খুরশীদ ইমতিয়াজের। চারগুপাঁচজন সহযোগীকে সে সঙ্গে নিয়ে আসে। ফ্লানেলের শার্ট গায়ে চড়িয়ে, সেই যে সকালে ওরা আসবে, বিকেল পর্যন্ত থাকবে। নাচের প্ল্যাটফর্ম বানাবে, রঙবেরঙের আলো দেবে, ডিসকো লাইট ভাড়া করে এনে সেটা লাগাবে। ওর সঙ্গে স্পটগুলো ফিট করবে। রেকর্ড প্লেয়ার আর অ্যামপ্লিফায়ারের সঙ্গে স্পটলাইটগুলোর সংযোগ হবে। যেন গানের তালে তালে আলোগুলো জ্বলে ওঠে। আবার যেন নিভেও যায় তাল মিলিয়ে।

পার্টির কাজটা যদিও বেশি শক্ত নয়, দরকার পড়ে অর্কেস্ট্রেশনের। সঞ্জরী সেটা বুঝতে পারে। এবং এ ব্যাপারে খুরশীদ ভাইয়ের জোড়া নেই। খরশীদ ভাই অর্কেস্ট্রেশন জানেন। এ পুরো বাঙালী সমাজে কে কোন্ কাজটা সুন্দরভাবে সমাধা করতে পারে, খুরশীদ সেটা ভালোভাবে জানে। জানে, কার হাতে রসগোল্লার জ্বালটা ভালো জমে, কোন্ সংসারে রসমালাই ভালো হয়, কোন্ ঘরের গিন্নী ইলিশ মাছে সরষে দিয়ে সুন্দর করে স্ন্যাক বানাতে পারে। আরো জানে কোন্ পুরুষ কেক বেক করতে ভীষণ ইচ্ছুক। কার সেলারে অতি পুরোন মদ রয়েছে। এবং কারা আউট অব পকেট এক্সপেন্স মিট করার জন্য ক্যাশ ডোনেট করতে তৈরি থাকবে। সেই হিসেবে চটপট দায়িত্ব বনে যায়,

টেলিফোন শুরু হয়ে যায়।

ফুটবল খেলায় প্রতিটি খেলোয়াড় যেমন তীব্রগতিতে গোলের দিকে ধাওয়া করে, তেমনি খুরশীদ ইমতিয়াজের ইঙ্গিত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বাঙালী নিউ ইয়ার্সের উচ্ছলতাকে জীবন্ত করতে ছুটে আসে। রাত ন'টা বাজতে না বাজতেই যুগলে যুগলে ওরা আসতে থাকে। কেউ আনবে ড্রিংকস। কেউ আনবে খাবার। কেউ স্ন্যাকস আবার কেউবা ডিজপোজেবল গ্লাস, প্লেটস, কাঁটা চামচ। নিজেরাই আনে, নিজেরাই সাজায়, নিজেরাই তত্ত্বাবধান করে। সঞ্জরী সাবেতের কোনো কাজ নেই। শুধু একটি ছাড়া। ওকে ঘুরে বেড়াতে হয়, মিশতে হয়, হাসতে হয়, মডেলের মতো। সারাজীবন সঞ্জরী মডেল সেজেছে, তবে আজকে রাতের মডেলিংয়ে ও সবচে' উজ্জ্বল।

আর দুটো হাত এগিয়ে যেতে পারলেই সঞ্জরী বারের কাছে এগিয়ে যেতে পারবে। বেতের তৈরি বার। বাংলাদেশ থেকে আনানো। বড় শখ করে ওদের দু'জনের ছায়ায় বড় হয়ে উঠেছে সঞ্জরী। শরীরকে গড়ে তুলেছে অস্ত্র করে। পুরুষ ধরার অস্ত্র, পুরুষের মন জখমের অস্ত্র। সেই অস্ত্র এই পঁয়ত্রিশ বছরের অনুক্ষণ ব্যবহারেও ভোঁতা হয়ে যায়নি। জং পড়েনি। ওর শরীরের বাঁধন দেখে পুরুষ মুগ্ধ হয়। ওর নাচের ভঙ্গিমা আর শরীরে বাঁকগুলো এখনও যুবককে আকর্ষিত করে। সঞ্জরীর অহমিকা স্ফীত হয়।

থেমে যেওনা সঞ্জরী। নাচো। আরো একবার নাচো। অল্পে আমরা তুষ্ট নই সঞ্জরী, অনেকগুলো গলা একসঙ্গে ঝলকে ওঠে। আরো চাই। আরো দাও আমাদের সঞ্জরী।

ওদের কথায় চমক ভাঙে সঞ্জরীর। দেখে কখন যেন ফ্লোর খালি হয়ে গেছে। মাঝখানে আপন মনে নাচছে শুধু ওরা দু'জনই। জোনাথান আর সঞ্জরী। নাচের জনতা গোল হয়ে ওদের ঘিরে রেখেছে। জোড়হাত দিয়ে তাল দিচ্ছে। ওদের যুগল নাচ দেখছে। হাততালি হচ্ছে। শংকিত হয় সঞ্জরী। ঠোঁটে এক জ্বলন্ত হাসি এসেই মিলিয়ে যায়। বলে- এসো জোনাথান, ট্যাঙ্গো করি আমরা। জোনাথান খুশি হয়ে ওঠে। অবকোর্স আই কুড্ ডু দিস্ বেটার। সঞ্জরীর কানের কাছে এনে বলে, এসো আমরা আবার দু'জনে নাচ শুরু করি।

ল্যাটিন রিদমে বাজনা বাজে। ফ্লোর হয়ে ওঠে সবুজ। আশ্চর্য সবুজ। সঞ্জরী অবুঝ নায়িকার মতো জোনাথানের হাত ধরে। জোনাথান ওকে এগিয়ে নেয়, পিছু টানে, ঘোরায় ওর নিজের মনের মতো। সঞ্জরী শুধু কথা শোনে, তাকায়। যেন অবোধ অসহায় নারী। উদ্দাম হয়ে ওঠে তালি। উল্লসিত হয়ে ওঠে অনেকগুলো লোভাতুর চোখ। সঞ্জরী খেয়াল করেনা, পরোয়া রাখেনা। সঞ্জরী নিজের নাচে নিজেই বিভোর হয়ে ওঠে।

বেরিয়ে এসো সঞ্জরী। বেরিয়ে এসো বিশ্রী নাচ থেকে। একটি কর্কশ আদেশ হঠাৎ সব উদ্দামতা, সব স্বচ্ছতাকে ভেঙে দেয়। খুরশীদ ইমতিয়াজের গলা, এখন তোমার নিজের নাচ দেখবো আমরা আজকে। এসো সঞ্জরী। এই আনন্দময় রজনীকে মোহময় করে তোলো তুমি তোমার দেহভঙ্গিমায়। খুরশীদ কাব্যিক হয়ে ওঠে।

না না, সে কি করে হয়। কপট লজ্জায় বাঁক ঘোরে সঞ্জরী। দেহবল্লরীর প্রতিটি অংশ প্রতিভাত করে।

হতেই হবে-খুরশীদ বলে, জোনাথান, তুমি সরে যাও, আমরা আজ শুধু একক সঞ্জরীর নাচ দেখবো। জোনাথান ভীত চোখে নাচের ফ্লোর থেকে সরে পড়ে। অন্যে হুকুম দিয়ে নাচের পার্টনারকে সরিয়ে দিতে পারা, সেটা শুধু এই বাঙালী সংস্কৃতিতেই সম্ভব! অন্য সংস্কৃতিতে নয়। নিজেকে গুটিয়ে আনে জোনাথান। একদম পেছনে চলে যায়। সেখান থেকে গলা উঁচু করে দেখতে থাকে, কি হয়।

বেশ তো। আপনার কথা আমি কি না শুনে পারি খুরশীদ ভাই। সঞ্জরী এগিয়ে আসে। ওর রক্তবরণ শাড়ির আঁচলটা সরিয়ে নিয়ে কোমরে পেঁচায়। উঁচু করে কুচি করে তোলে শাড়ির ঝালরটা। শাদা পা দুটো পদ্মের মতো ফ্লোরে ভেসে ওঠে। তবে আপনারা হাসবেন না যেন। আমি কিন্তু একদম নাচতে পারিনা।

অথচ নিখুঁত অভিনয় করে যায় সঞ্জরী। কখনো কথায়, কখনো নেচে, কখনো গেয়ে, কখনোপাশ নেচে। আশ্চর্য অভিনয়ের ঢংটা ওর। স্তম্ভিত জনতা চেঁচিয়ে ওঠে। এন্কোর। এন্কোর। চিৎকার করে। সঞ্জরী, আবার আবার। আবার দেখতে চাই আমরা।

না, আর নয়, সঞ্জরী বলে। মনে মনে বলে, বাঘের চোখের সামনে শুধু মাংসের ইশারা দিতে হবে। মাংস দিতে হবে না। ওটা গুছিয়ে রাখতে হবে। নয় ম্যাজিক টাচ নষ্ট হয়ে যায়। জৌলুস ঝুলে পড়ে।

এবারে ডিসকো নাচ হবে। আপনারা নাচুন। সঞ্জরী আদেশ করে। আমি ফিরে আসছি। সম্রাজ্ঞীর মতো সঞ্জরী ধীর পায়ে ফ্লোর থেকে বেরিয়ে আসে।

প্লিজ জোনাথান, আমার জন্য একটু রামে কোন মিলিয়ে নিয়ে আসবে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে। কখন থেকে যে ডিংক চাইছি। ঘর্মাক্ত নীলুফার মিত্র অনুরোধ করে।

নিশ্চয়ই। জোনাথান সটান ছুটে যায়। পর মুহূর্তে ড্রিংক নিয়ে ফিরে আসে। তুমি ছিলে কোথায় নীলুফার, সারাটা সন্ধ্যা দেখতে পাইনি।

প্রশ্নটা তোমাকে করলে কি চলে না জোনাথান। নীলুফার মিত্র উল্টো বলে। আমার সঙ্গে এলে আর এসেই কোথায় উধাও হয়ে গেলে। নীলুফার মুখ টিপে টিপে অনুযোগ করে।

রাগ না ঈর্ষা? নীলুফারের কথায় বোঝা যায় না। চুমুক দেয় গ্লাসে নীলুফার। আহা, স্প্লেন্ডিড্। যাই করো না কেন জোনাথান, তুমি কিন্তু ড্রিংক মিক্স করতে পারো ভালো।

হ্যাঁ, জোনাথান মুখ নাড়ে, হাসে। না, আজ রাতে নীলুফারকে ঘাঁটানো ভালো হবেনা। ওর অনুযোগের উত্তর দিয়ে লাভ নেই।

সঞ্জরীর তেষ্টা বেড়েই চলেছে। কি আশ্চর্য, নিজের বাড়িতে একটু ড্রিংক নিজে নিতে পারছে না। বারে ওকে যেতেই হবে। ফ্লোরের ভিড় বেড়ে উঠেছে। রাত আজ যতো বাড়চে, নাচের রিদম যেন ততো তুমুল হয়ে উঠছে। অবশেষে বারের সামনে এসে দাঁড়ালো সঞ্জরী।

কিছু নেবে তুমি সঞ্জরী, আমি বানিয়ে দিচ্ছি, খুরশীদ জিজ্ঞেস করে। খুরশীদ কখন বারের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি সঞ্জরী।

হ্যাঁ, দাও না খুরশীদ ভাই, সেই কখন থেকে একটা ডায়াকেরীর জন্যে গলাটা শুকিয়ে গেছে।

তার চেয়ে টেকিলা নিয়ে আসি। মেক্সিকান ড্রিংক। নেচে তুমি টায়ার্ড, এখন ভালোই লাগবে। খুরশীদ সাজেষ্ট করে।

খুরশীদ ভাই, মেয়েদের মন ভোলাতে জানেন আপনি। নসরতের জন্যে আমার হিংসা হয়। সঞ্জরী মুখ টিপে বলে। শরীর নাচায়। স্বল্প আলোয় মৃগেল মাছের মতো পিছলে ওঠে। মাঝে মাঝে জ্বলে, ঝলসে ওঠে ওর শরীর।

খুরশীদ হাসে। সারাক্ষণ ঝগড়া, কথা কাটাকাটি করেই চলছি আমরা। কোথায় কোন মেয়ের সঙ্গে হেসে আমি কথা বলেছি, কার রুমাল আমার পকেটে এসেছে সেই নিয়েই নসরতের খালি অনুযোগ।

বারে অন্য মেয়ের রুমাল আপনার পকেটেই বা আসবে কেন? সঞ্জরী চোখ নাচায়।

না, না, ওসব নসরতের কল্পনা। ও বানিয়ে বলে। সেদিন একটা পার্টিতে কার একটা রুমাল ফ্লোরে পড়েছিলো, আমি তুলে নিলাম ফেরত দেবো বলে, তাতেই নসরতের রাগ। খুরশীদ হেঁচকি এড়াতে এড়াতে বলে। ওর বেদম অভিমান।

আপনি নসরতকে খামোকাই দোষ দিচ্ছেন। ওর মতো ভালো মেয়ে হয় না।

সেটা ঠিক। যতোই ঝগড়া করুক না কেন বিশ্বাসটা আমার ওপর ঠিকই রেখেছে। সেজন্যেই তো টিকে আছি।খুরশীদ ইমতিয়াজ কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে।

সঞ্জরী হাসে। নিন, নিন, আর কথা না বাড়িয়ে টেকিলাটা দিন। ড্রিংকটা নিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে সঞ্জরী।

ভীষণ গরম লাগছে, বেসমেন্টা আর সহ্য হচ্ছে না ওর। ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে আসতে থাকে সঞ্জরী। যেতে যেতেই টেকিলাটা মুখে দেয়। আরে, এ তো ভীষণ তেতো! মুখটা আরো বিষিয়ে এলো। নাহ্, সন্ধ্যাটাই পুরো বিষাক্ত। না শ্যাম্পেন, না টেকিলা, না রাম মেশানো কোক। কোনটাই মুখে রুচলোনা সঞ্জরীর। বেসমেন্ট থেকে বিরয়ে এসেই ফ্যামিলি রুমে ঢোকে সঞ্জরী। এখানেও লোকের জটলা। সারাটা বাড়ি লোকে গিজগিজ করছে। গমগম

করছে। ভারি অসুখী লাগছে সঞ্জরীর। নিভৃতি চাই, একটু একা থাকতে চাই। তাও পারছে না।

এসো সঞ্জরী, এসো, আমাদের সঙ্গে গল্প করো। জটলা করা লোকজনের মাঝে কে যেন ওকে ডাকে। সঞ্জরী ঠিক ঠাহর করতে পারছে না, চিনতে পারছে না।

না, আমি ওপর থেকে আসছি। সঞ্জরী ওপরে উঠতে থাকে। কারো ডাক আজ ও শুনবে না, এখন ওর একাকী থাকার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে।

ওহ্, এ বাড়ির ভিড়ের যেন শেষ নেই। বেসমেন্ট থেকে চিলেকোঠা, চিলেকোঠা থেকে শোবার ঘর পর্যন্ত। তেতাল্লিশটা সিঁড়ি গুনে গুনে দেখেছে সঞ্জরী। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে সাফ করার সময় নাভিশ্বাস উঠে যায়। নল টেনে টেনে ভ্যাকুয়াম করা চাট্টিখানি কথা নয়। অথচ বাড়ি কেনার সময় ওপরের চিলেকোঠা দেখেই ভারি পছন্দ হয়েছিলো সঞ্জরীর এবং এহসানের। দুটো রুমেরই ফেসিং ভালো। একটা পটোম্যাক নদীর দিকে ফেস্ করেছে। জানালায় দাঁড়ালেই মনে হয় হাত বাড়ালেই ওই মরা নদীর ঢেউগুলোকে ছুঁতে পারবে। অন্যটা পার্ককে ফেস করেছে। গ্রেট ফল্সের ঘন শালে বন। ঝিরঝিরে হাওয়া সারাক্ষণ বইছে। শীতে মুধু পাতা পড়ে। গাছগুলো ন্যাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দারুণ!

আর ঘর দুটো যেন সারাবাড়ি থেকে আশ্চর্য দূরে। এখানে এলে মনে হয় যেন হিমালয়ের শীর্ষে এসে বসেছি। কেউ নেই, নির্জন।

নদীর ঢেউগুলোকে আমার ভীষণ ভালো লাগবে, এহসান। এটা আমার বেডরুম হবে। জঞ্জরী হেসে বলেছে।

আর ওটা হবে আমার স্টুডিও। তাতে ইজেল থাকবে, রঙ থাকবে, তুলি থাকবে, আর তুমি থাকবে- এহসান তাতে সায় দেয়। ভালোই হয়েছে, এখানে আমি তোমায় মন ভরে আঁকতে পারবো। কেউ আমার ডিষ্টার্ব করবে না।

শুধু আঁকতেই জানো-টিপ্পনী কেটেছে সঞ্জরী, আঁকা ছাড়া অন্য কোনো আকর্ষণ তোমার জীবনে নেই এহসান।

আঁকবো বলেই তো তোমায় পেয়েছি সঞ্জরী। আমার তুলিতে তোমায় ধরবো

বলেই তো আমার জীবনে তোমাকে জুটিয়েছি।

শুনে সঞ্জরীর মনে সোহাগ এসেছে। ঘন হয়ে কাছে দাঁড়িয়েছে এহসানের। তিন লাখ ডলারের বাড়ির সওদা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই।

সঞ্জরী ধীর পায়ে আরো ওপরে সিঁড়ি বায়। উঠে আলতো নাড়া দিয়ে পায়ের স্যাণ্ডেল ঝেড়ে ফেলে। সিঁড়ি দিয়ে ঝরঝর করে পড়ে যায়। পড়ুক। ওই সোহাগ দেখানো পুরুষগুলোর মাথায় ঠিকরে পড়ুক! ধীর পায়ে এহসানের ষ্টুডিওতে ঢোকে সঞ্জরী।

ওহ্‌, আচ্ছা বেহায়া মেয়েটা তো। তোয়াল নিয়ে বুকটাকে জড়িয়ে নিলেই পারতো কিংবা পারতো কালো লম্বা চুল ঘাড়ের ওপর দিয়ে নিয়ে বুকটাকে ঢেকে রাখতে। নিজের প্রোর্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে সঞ্জরী নিজের মনেই বলে। কিন্তু এহসান সেটা হতে দেবে না। সে নিয়ে কতো মন কষাকষি। ওর নাকি নগ্নতা ভালো লাগে, তাই পোজ দিতে হবে চমক দিয়ে। ঝলসে ওঠা শরীরে।

বেশ, তুমি আমার ওই ছবি দুটো লোকজনকে দেখাবে না, সে কথা দাও। আবদার তুলেছে সঞ্জরী।

দেখাতেও পারি। মুখ টিপেটিপে হেসেছে এহসান, আপাতত বসো তো ছবিটা তোমার শেষ করি।

না। সঞ্জরী বলেছে, তুমি কথা দাও, এ ছবি শুধু আমার, শুধু আমাদের। তবেই আমি তোমার তুলির সামনে দাঁড়াবো। হ্যাঁ কথা দিচ্ছি-এহসান তুলি তুলে বলে।

অথচ শেষ যেন হতেই চায় না ছবিটা। চার বছর হয়ে গেলো ওরা এ বাড়িতে এসেছে। প্রতিটি সন্ধ্যায়, প্রতিটি উইকএণ্ডে সিটিং দিয়েছে। ঘন্টার পর ঘন্টা এহসানের তুলি চলেছে। দাঁড়াতে দাঁড়াতে মাঝে মাঝে ওর নগ্ন শরীর শীতে কেঁপে কেঁপে উঠেছে। তবু এহসান একরোখা। শুনবে না। না না আরেকটু দাঁড়াও। না না লক্ষ্মীটি তোয়ালেটা জড়িয়ে নিয়ো না। ছবির ইমেজট চলে যাবে। অথচ ছবি শেষ হয় না এহসানের। এমনি স্লো।

এই বারো বছরের বিবাহিত জীবনে কতোগুলো ছবি আঁকলো এহসান? পনেরো

বা কুড়িটা। শুধু ধরাই সার। একটা ছবিও শেষ করেনি সঞ্জরীর। একটা ছবিরও ফিনিশিং টাচ দেয়নি। সবকিছুই রেখে দিয়েছে পারফেক্ট মুড আসার জন্য। কিন্তু মুড যে আসে না এহসানের। একটা ছবি শেষ করার আগেই নতুন আরেকটা ছবি ধরে বসে এহসান।

না, আর সিটিং দেবে না সঞ্জরী। পোজ দেয়াট এখন একঘেয়েমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিট ইউকএণ্ডে মধ্যরাত পর্যন্ত জেগে থেকে পোজ দেয়া সঞ্জরীর আর ভালো লাগছে না। পার্টি থাকলেও আর বাঁচোয়া নেই, রেহাই নেই। যতো রাতই হোক না কেন, ফিরে এসে কাপড় ছাড়তে হবে সঞ্জরীকে, দাঁড়াতে হবে এই ইজেলের সামনে। আলোটা অ্যারেঞ্জ করবে এহসান, তুলি হাতে নেবে। সঞ্জরী হাই তুলবে, ঘুমুতে চাইবে। এহসান বাধা দেবে। এহসান আঁকবে।

না। ভীষণ টায়ার্ড আজ সঞ্জরী। দাঁড়াতে পারছে না, মাথাটা টনটন করছে। টেকিলায় চুমুক দিয়ে মুখটা আরো তেতো হয়েছে। বেডরুমে ঢুকে সঞ্জরী দরোজাটা অল্প ভেজিয়ে দেয়। বাথরুমে যায়, সিঙ্কে উপুড় করে ফেলে দেয় ড্রিংকটাকে। মেক্সিকোন ড্রিংক, ওটা মেক্সিকানদের জন্য থাকুক। সঞ্জরী আপন মনে বলে।

গলাটা জ্বলছে সঞ্জরীর। মেডিসিন ক্লোসেটটা খুলে এ্যাস্পিরিনের দুটো ট্যাবলেট বের করে মুখে দেয়। ক্লোসেট বন্ধ করে। বাথরুমের আয়নার দিকে তাকায় সঞ্জরী। কপালে দু'একটা ঘাম এখনও জমে রয়েছে। নাচের ক্লঅন্তিতে এই বরফ শীতেও ওর রক্তাক্ত কপালের ওপর দু'ফোটা ঘাম টলটল করছে। চোখট বসে গেছে, চোখের নীচে কালি পড়েছে। না, আর নীচে নামবে না সঞ্জরী। ঘুম পাচ্ছে, হাই উঠছে। পার্টি যখন ভাঙার তখন ভাঙবে। যে যাবার সে যাবে। খুরশীদ ইমতিয়াজ আছে। সেই তদারক করতে পারবে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে সঞ্জরী। তাকায়। বড় কুইনসাইজের বিছানাটা পরিপাটি করে সাজানো। বেডকভারে মোড়া, কোনো ভাঁজ নেই। ভাঁজ ভাঙা বিছানায় সঞ্জরী ঘুমাতে পারে না। নিভাঁজ থাকতে হবে বিছানা। মাঝখানে একটা বালিশ। মধ্যমণির মতো। শরীর মেলে দিয়ে একাই ঘুমুবে সঞ্জরী।

এহসান থাকতে ভালোবাসে ষ্টুডিওতে। ঘুমোয়ও সেখানে। ফিরে তাকায়

সঞ্জরী। বিছানার মধ্যে কোনো আমন্ত্রণ নেই। আশ্চর্য কোল্ড, আশ্চর্য নির্লিপ্ত! ওই শীতল বিছানায় ও ঘুমুতে পারবে না। বেরিয়ে এলো সঞ্জরী। নাচে ফিরে যাবো নাকি. না, আজ আর নয়। ওই নাচের দলের ভিড়ে আবার ঢুক্তে ইচ্ছে করছে না। সেধোতে ইচ্ছে করছে না সঞ্জরীর।

ধীর পায়ে ষ্টুডিওতে ফিরে এলো সঞ্জরী। তাকিয়ে দেখলো। ছিঃ, এখনও বেহায়ার মতো মেয়েটা তাকিয়ে আছে। এহসানের কল্পনায় ধরা সঞ্জরী। কিন্তু ছবির সঙ্গে ওর নিজের কোনো মিল খুঁজে পায় না সঞ্জরী। বারবার তাকিয়ে দেখেছে। কম্পেয়ার করেছে। অথচ এহসান মিল পায়। এহসান ভালোবাসে ক্যানভাসের মোহময়ী মেয়েটিকে। সারারাত ঘুমের মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে। খুশী হয়, আনন্দ পায়। কেন, সঞ্জরী বুঝে পায় না। অথচ পাশের ঘরেই জীবন্ত সঞ্জরী অপেক্ষা করছে। ঘুমের মাঝেই। এহসানের তপ্ত স্পর্শের জন্যে। নাহ্, ভীষণ বেহায়া, ভীষণ নির্লজ্জ, আদেখলেপনা মেয়েটার মধ্যে। এ সঞ্জরীর ছবি কিছুতেই হতে পারে না। সঞ্জরী অমন নির্লজ্জ নয়। অমন গা খুলে বুক নাচিয়ে শরীর বেঁকিয়ে সঞ্জরী ওর যৌবন ধরে রাখে না।

হঠাৎ রেগে যায় সঞ্জরী, তুলিতে এক ছোপ ম্যাজেন্টা তুলে নিয়ে লম্বা হাতে টেনে দেয় মেয়েটির ডান গালে। রক্তিম গালে লম্বা নখের আঁচড়ের মতো বসে যায়। রক্ত যেন ছিটকে বেরুচ্ছে। হাসে সঞ্জরী, খিলখিলিয়ে হাসে।

না, ও আজকের সঞ্জরী হতে পারে না। কখনো পারেনি।

সঞ্জরী বসে পড়ে ষ্টুলের ওপরে। ইজেলটা পাশে টেনে নেয়। ধীরে কাপড় ছাড়তে থাকে। পোজ দিতে হবে নতুন করে। নতুন করে সঞ্জরীকে আঁকতে হবে এহসানের।

কেন রয়ে গেলো আজ রাতে এহসান লণ্ডনে? সঞ্জরী আপন মনেই বলে, স্পট ওভার না নিয়ে ইচ্ছে করলে কি তুমি সোজা আসতে পারতে না এহসান? না হয় ক্লান্ত হতে, না হল জেট ল্যাগ। তবুও কি পারতে না শুধু আমার জন্যে? সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হওয়ার সাথে সাথে কি চলে আসতে পারতেনা এহসান।

সঞ্জরী ভাবে। না আর বসে নয়, আজ দাঁড়িয়ে পোজ দেবে সঞ্জরী। নতুন পোজ আজ এহসানকে অবাক রে দেবে। শরীরটাকে ধনুকের মতো টেনে রেখে এক এক করে কাপড় ছাড়ে সঞ্জরী। স্টুডিওর সাদা স্পট লাইটের হালকা আলো ওর শরীরটাকে অশেষ স্নেহে আঁকড়ে রাখে। জড়িয়ে রাখে।

সঞ্জরী দীপ্ত হয়ে দাঁড়ায়, ভেনাসের মতো। মনে মনে বলে, আমার যে আজ ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে তোমার তুলির সামনে দাঁড়াতে, এহসান। কেন এলে না এহসান?

ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে সঞ্জরী। নীচে তখনও নতুন বছরের আমন্ত্রণে ল্যাটিন রিদম উদ্দাম বেজে চলেছে।

ওয়াশিংটনের শীতের হাওয়া সে যেন খেয়ালী নদী। ভীষণ ফিকল্। যখন যে ডাকবে, তারই সাড়ায় উৎসবে মাতবে। তারই মনে মতো করে সাজবে। উত্তরে কনকনে আর্টিক হাওয়া নেমে এলে মুখ লুকোবে তুষারের মাফলারে। ফিজিংউইস্কের স্কার্ট পরে লণ্ডভণ্ড করে দেবে পথচারী ট্রাফিক। আবার দক্ষিণের গালফ্ অব মেক্সিকোর হাওয়া এলেই খুশিতে উচ্ছল হবে। তুষারের ঘোমটা ঝটকে ঝেড়ে ফেলে মুখ তুলবে উদার আকাশে, নাচবে গাইবে, অঙ্গে নকশা তুলবে।

জানুয়ারির এ প্রথম কাজের সকালে মিঠে হাওয়া নেমেছে ভোর থেকে। এমনিতেই উইকএন্ডের পরে অফিসে যেতে মন চায় না ইমতিয়াজের। আলসেমি চেপে ধরে। লেপমুড়ি দিয়ে মর্নিংনিউজ শুনতে শুনতে ভারি ভালো লাগে। তার ওপর লম্বা ছুটির শনি, রবি, সোমবারের যথেচ্ছাচারের পর মঙ্গলবার ভোর বেশ মিষ্টি, বিছানা ছাড়তে চায় না ইমতিয়াজ। রাত্রি বরফের চাদরে মোড়া ছিলো। ভোরে দেখে সে চাদর অল্প অল্প গলছে। ধূসর রঙের দু'চারটি স্কুইরেল খাবার খুঁজছে কাঠের ডেকের চারপাশে। লাল রঙের চড়ুইগুলো চিক করে ডাকছে।

চড়ুই সচরাচর দেখা যায় না ওয়াশিংটনে। ভীষণ মিস করে চড়ুইকে খুরশীদ ইমতিয়াজ। মনে পড়ে এখন ঢাকায় জানুয়ারির সকালে হয়তো এমনি কুয়াশা নেমেছে। টরঠলে দু'একটা তুষারের ফোটা জমে উঠেছে দুর্বার ওপর। আর চড়ুইগুলো নির্যাসের মাঝে চুমুক দিচ্ছে। এমন সময়ে ইমতিয়াজের আর বিছানায় থাকতে ইচ্ছে হয় না। লাফ দিয়ে ওঠে। পাঁচ মিনিটের মাঝেই শেভিং আর গোসল সেরে বেরিয়ে পড়ে। চা খাবার তর সয় না। বাইরে বেরুতে হবে। ওর উদার হাওয়া খুরশীদকে ডাকছে।

প্রকৃতির এই চাঞ্চল্য ভীষণভাবে নাড়া দেয় খুরশীদ ইমতিয়াজকে। গাড়িটা নিয়েই বেরিয়ে পড়ে। অতো ভোরে ট্রাফিক থাকে না। সূর্য ওঠে পৌনে সাতটায়। ইমতিয়াজ বেরিয়ে পড়ে সাতটায়। কুড়ি মিনিটে পৌঁছেছে যায় ডাউনটাউনে।

ইন্টারন্যাশনাল স্কোয়ার। জায়গাটা নিজেই খুঁজে পেতে পছন্দ করেছে ইমতিয়াজ। ভাড়া বেশি হলেও এটা সেন্ট্রাল। কেন্দ্রীয় স্থান। দু'ব্লক দূরেই রয়েছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। আর তার পাশেই ইন্টারন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ড। একটু দূরে ডিরেক্ট মেট্রো বাস ধরে সোজা চলে যাওয়া যাবে ভয়েস অব আমেরিকায়। আর কয়েকটা ব্লক দূরেই রয়েছে বাংলাদেশ এ্যামবেসী। অবশ্য উল্টোদিকে। বাঙালীরা সব চারপাশেই রয়েছে। কাজ করছে, কেউ ব্যবসায়, কেউ ব্যাংকে, কেউ ফাণ্ডে। ইমতিয়াজের অফিস তাদের সবার কেন্দ্রবিন্দু। ওরাই তো বলতে গেলে ইমতিয়াজের মেইন ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্টদের আসার সুবিধে হবে। পার্টনারদের বোঝাতে অসুবিধা হয়নি খুরশীদ ইমতিয়াজের। খুরশীদ ইমতিয়াজ নিজের অফিসেও কেন্দ্রবিন্দু হতে চেয়েছে। নিজের চেম্বারে ঢুকে খুশিতে মন ভরে ওঠে খুরশীদ ইমতিয়াজের। প্রশস্ত কাঠের ডেস্কের ওপরে এককাপ কফি, ধোঁয়া উঠেছে, সদ্য ব্রু করা, এরোমাতে ঘর ভরে উঠেছে। প্রসন্ন হয় খুরশীদ। মেয়েটির খেয়াল আছে, জানে কি সে পছন্দ করে, কিসে ওর মুগ্ধ আকর্ষণ। আচ্ছা, নসরত যদি এমনি খেয়াল রাখতো। খুরশীদ ইমতিয়াজের জীবন কি আরো মুগ্ধময় হয়ে উঠতো না!

গুডমর্নিং। মিস্টার ইমতিয়াজ, আজকে তো তোমার ভারি কাজের সিডিউল।

অনেকগুলো ব্রীফ রয়েছে। ন্যান্সি একগাদা ফাইল নিয়ে ঘরে ঢোকে।

গুডমর্নিং। ন্যান্সি। এতো ভোরে এসেছো তুমি! ন'টার আগে তো তোমার আসার কথা নয়। ইমতিয়াজের গলায় কপট গাম্ভীর্য। এমনিতে বয়স কম ন্যান্সির। সদ্য স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। কতো হবে, কুড়ি একুশ। ইমতিয়াজের গম্ভীর মুখ দেখে ও ঘাবড়ে যায়।

আমতা আমতা করে বলে, না, নববর্ষের ছুটির আগে দেখেছিলাম তোমার এ সপ্তাহের সিডিউল বড় টাইট। সেজন্যেই আগে চলে এলাম। যদি তুমি এসে আমায় না পাও, যদি তোমার অনেক ডিক্টেশন দেয়ার থাকে। ন্যান্সি বলে।

না পেলে ভালোই হতো। স্মিত হাসে ইমতিয়াজ। আমি একাকী ওই জানালায় দাঁড়িয়ে পাখিদের খাওয়া দেখতে পেতাম। কিংবা তারচে' দূরে তাকিয়ে থাকতাম, পোটোম্যাক নদীর পাশে, কুয়াশা যেখানে ঘন হয়ে জমেছে। খবর নিতে পারতাম উড়ে যাওয়া শীতের পাখীদের। অবশ্য এই গরম কফিটা পেতাম না, থ্যাংকস। জানো, আমি কিন্তু নিজেই ব্রু করেছি। ন্যান্সি আশ্বস্তি দিয়ে বলে, কফিতে ক্যাফিন একেবারে নেই, তোমার তো তাই পছন্দ। ন্যান্সির গলায় এবার উৎসাহ।

কফির জন্য আমার এই দুর্বলতাকে তুমি প্রশ্রয় দিয়ো না ন্যান্সি।

বেশ দেবো না, এবার কাজে বসো। তোমার প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইশতিয়াকের সাথে। ন্যান্সি হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।

কফিতে চুমুক দিয়ে ডিভানে সিঁধিয়ে যায় খুরশীদ ইমতিয়াজ।

ইশতিয়াক বেশ চিন্তিত। ওর জন্য একটা ভালো উপায় খুঁজতে হবে। ধরাধরি করতে হলে করবো। ইশতিয়াককে ভারি পছন্দ করে খুরশীদ। বিনীত, ব্রিলিয়ান্ট, ভদ্র। আদব-কায়দা জানা আছে। মান্যিগণ্যি করে। অন্যান্য ছেলেদের মতো আপস্টার্ট হয়ে ওঠে না। নীলুফার মিত্র ছেলে মানুষ করতে জানে।

খুরশীদ ইমতিয়াজের ভাবনায় বাধা পড়ে। ইন্টারকমে ন্যান্সির গলা ভেসে আসে। ইশতিয়াক আগেই এসে গেছে, পাঠিয়ে দেবো?

দাও, আমার সময় বাঁচবে। খুরশীদ উৎসাহ জানায়।

ইশতিয়াক ঘরে ঢোকে। লম্বা দীঘল শরীর। পাতলা, চুল কোঁকড়ানো, চোখ জ্বল জ্বল করছে বুদ্ধিতে। থ্রিপিস স্যুট পরেছে, টাইয়ের নটটিও নিখুঁত। আসতে পারি আঙ্কেল? -সুইংডোর সরিয়ে ইশতিয়াকের মুখ ভেসে ওঠে। এসো, এসো, তোমার কথাই ভাবছি। খুরশীদ ইমতিয়াজ বলে।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে ইশতিয়াক বলে, সারারাত ঘুম হয়নি আঙ্কেল, ভীষণ নার্ভাস। সে জন্যেই আগে চলে এলাম।

ভালোই করেছো। আমি তোমার কথা লং উইক এণ্ড ভর ভেবে দেখেছি। আই. বি. এম.-এ চাকরিটা তবে তুমি নেবেই?

এমন সুযোগ কোথায় পাবো বলুন? ইশতিয়াক বলে, বছরে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার দেবে, যখন খুশি বিদেশে যেতে পারবো। যখন খুশি ফিরতে পারবো। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে ওরা জানতে চায়। ইসলামী পারসপেকটিভ পেতে চায়, আর মুসলিম ফাণ্ডামেন্টালিজম মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে কী ইনফ্লুয়েন্স করছে তাও জানতে চায়। তারা বিশ্বাস করে আমি সেটা দিতে পারবো।

আমিও সেটা বিশ্বাস করি ইশতিয়াক। তোমার মধ্যে ব্রিলিয়ান্স আছে। তুমি পারবে সে দায়িত্ব নিতে, খুরশীদ বলে। সে জন্যেই আমি আই. বি. এ.-এর পারসোনেল অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছি গেলো শুক্রবার। ওরা ভীষণ ইগার তোমায় নিতে, শুধু এক শর্ত।

কী সেটা? ইশতিয়াক উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করে।

শর্ত হচ্ছে তোমায় আমেরিকান সিটিজেনশীপ নিতে হবে। বা গ্রীন কার্ড পেতে হবে।

আমি তো তৈরিই আঙ্কেল। ইশতিয়াক উদগ্রীব হয়ে বলে। আই. বি. এম. আমাকে স্পন্সর করুক না কেন, আমি রাজি।

সেই তো বাধা। খুরশীদ ইমতিয়াজ চিন্তিত মুখে বলে। ওদের বোর্ড অব গভর্নরস অসম্ভব কনজারভেটিভ। বোর্ড মেম্বারদের ধারণা, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের নাম করে আই. বি. এম. নাকি বহু বিদেশীকে যত্রতত্র ভালো চাকরিতে ঢুকিয়েছে। আমেরিকান সিটিজেনদের বঞ্চিত করেছে। সুতরাং

এখন থেকে শুধু আমেরিকান ছাড়া আর কেউ আই. বি. এ.ওএর চাকরি পাবে না। সেটাই মুশকিল। প্রেসিডেন্ট রিগান ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে কনজারভেটিজম যেন মার্কিন মুল্লুকে মাথা চেড়ে জেগেছে। লিবারেলরা কোথাও ঠাঁই পাচ্ছে না। শুধু কথা, বেল্টটাকে শক্ত করে টানো, রশি টানো। এ দেশের যা কিছু রীতি, যা কিছু ঐশ্বর্য, তা শুধু আমাদের, শুধু আমাদের জন্যেই ধরে রাখো। বিদেশীদের বহু দানখয়রাত করেছি। বহু ধ্যান করেছি, কিছুই হয়নি। শুধু আগ্লি আমেরিকান বদনাম কুড়িয়েছি। এখন আমরা কোথাও থাকবো না। কিছুই দেবো না। আমরা শক্ত হবো। আমাদের কথা না শুনলে আমাদের টাকাও বন্ধ। ইউনেস্কো থেকে আমরা উঠে আসবো। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে আমরা টাকা দেবো না। মরতে হয় মরুক থার্ড ওয়ার্ল্ড। পচতে হয় পচুক থার্ড ওয়ার্ল্ডের আটশো বিলিয়ন গরীব প্রাণী।

তবে কি ওরা আমায় একেবারেই স্পন্সর করবে না? চাকরিটা কি তাহলে নিতে পারবো না আঙ্কেল। ইশতিয়াকের গলা ভীষণ স্তিমিত।

উপায় নেই। গ্রীন কার্ড তোমাকেই প্রকিওর করতে হবে। ইমতিয়াজ বলে। ওরা একদম সাহায্য করবে না। এবং কোনো রকম ইনিসিয়েটিভও নেবে না। সেটা হবে সম্পূর্ণ তোমার দায়িত্ব।

তবে চাকরিটা আমার ফস্কে গেলোই, এতোবড় সুযোগ। ইশতিয়াকের মুখ হতাশায় ভরে ওঠে।

না, না, অতোটা আশা হারিও না। খুরশীদ প্রবোধ দেয়। আই. বি. এম. আমাকে প্রমিজ করেছে বছর খানেক অফারটা ওরা তোমার জন্যে ধরে রাখবে। তোমাকে ওরা চায়, তুমি ওদের ইম্প্রেস করেছো, সুতরাং এর মাঝে আমেরিকান ইমিগ্রেশনের সঙ্গে সমঝোতা আমাদেরই করতে হবে।

আপনি কোনো উপায় ভেবেছেন আঙ্কেল?

দেখো, উপায় তোমার দুটো। হয় তুমি থার্ড প্রেফারেন্সে সিটিজেনশীপ নেবে, অথবা ফিফথ প্রেফারেন্স। তবে থার্ডটা পেতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। তোমায় এস্টাবলিশ করতে হবে, তুমি তুখোড় ইনটেলেকচুয়াল।

মেরিটের কোটায় তুমি মার্কিন দেশে ইমেগ্রেশন সীক্ করছো।

হাসে ইশতিয়াক। এই বয়সে কি করে অতো বড় স্বীকৃতি জোগাড় করবো আঙ্কেল? শুধু কলেজে ভালো রেজাল্ট করা ছাড়া আমার তো আর অন্য কোনো পরিচয় নেই।

না, না, আইনের অনেক ফাঁক আছে। খুরশীদ আশ্বস্ত করে। মেরিট বা ব্রিলিয়ান্স কি। কয়েকটি মনের পারসপেকটিভ মাত্র। সুতরাং আইনর জন্যে কয়েকটি মেজারেবল ইয়ার্ডষ্টিক আছে। সেই ইয়ার্ডষ্টিকগুলো দেখাতে পারলে তুমি থার্ড প্রেফারেন্সগুলো নিতে পারো।

কি কি ইয়ার্ডষ্টিক আঙ্কেল, বলুন, দেখি মেলে কিনা।

২২

প্রথম হচ্ছে তোমার গ্রেড হবে এবোভ্ এভারেজ। সব সাবজেক্টে পেতে হবে।

সেটা আমার আছে। ইশতিয়াক উদগ্রীব হয়ে বলে।

খুশির কথা। পরে দরকার গোটা কুড়ি সার্টিফিকেট, টেস্টিমোনিয়াল। এসব ইমপ্রেশনের কাছে তোমার গুণগান, কেচ্ছা লিখে পাঠাতে হবে। কিছু টেস্টিমোনিয়াল লিখবেন কলেজের প্রফেসর। কিছু লিখবেন মার্কিন সিটিজেন, যারা তোমার পরশী, বা তোমায় ভালো জানেন। আর কিছু বিদেশের বুদ্ধিজীবী। বাংলাদেশ থেকে, ভারত থেকে, ইংল্যাণ্ড থেকে, ফ্রান্স থেকে।

অতোগুলো টেস্টিমোনিয়াল জোগাড় করা মুশকিল হবে আঙ্কেল।

মুশকিল! মোটেই না, একটু সময় নেবে। খুরশীদ বলে, তোমার মা বাবার সঙ্গে অনেক লোকের পরিচয় আছে। আমার সঙ্গেও অনেক লোকের পরিচয় আছে। তুমি চেনো অনেককে, সবাই তোমাকে প্রমোট করলে হয়ে যাবে, তবে সময় নেবে, দু’তিন বছর হয়তো। তদ্দিন তো তুমি অপেক্ষা করতে পারছো না। তার মানে এই চাকরিটা আমার হবে না।

না, না, তুমি খুব সহজে ভেঙে পড়ছো, অন্য আরেকটা উপায় আছে। সেটা হলো কোনো মার্কিন সিটিজেনকে বিয়ে করা। তাহলে চিন্তা নেই, সঙ্গে সঙ্গেই

গ্রীন কার্ড পেয়ে যাবে। সাতদিনের মধ্যে। কোনো বাধা-নিষেধ নেই। তোমার চাকরি নিতেও কোনো অসুবিধা হবে না।

আমি বিদেশী হলেও সিটিজেনশীপ পেতে অসুবিধা হবে না, ইমিগ্রেশন এখানে কোনো বাধা দেবে না! ইশতিয়াক বেশ অবাক হয়ে বলে।

হ্যাঁ, এই এক আশ্চর্য জাত। ফ্যামিলিতে বিশ্বাসী। পরিবারের বন্ধনে বিশ্বাসী। যতোই ডিভোর্স রেট বাড়ুক না কেন, যতোই সংসার ভেঙ্গে যাক না কেন, ততোই এদের ইচ্ছা, ফ্যামিলিকে প্রধান করতে হবে। ফ্যামিলি হবে সন্তান ও জীবনের প্রধান উৎস। সুতরাং সামান্য ভিসার জন্যে পরিবার বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। কোনো আমেরিকান সিটিজেন যদি অন্য দেশীকে বিয়ে করে, সেও এদেশে সাদরে আমন্ত্রিত। এটা প্রত্যেকটি আমেরিকান সিটিজেনের রাইট।

সেই বিয়ে করা ছেলে বা মেয়ে যদি অন্ধ হয়, কালা হয়, নুলো হয় তাহলেও ইমিগ্রেশন কোনোরকম বাধা দেবে না? ইশতিয়াক প্রশ্ন করে।

মোটেই না, সেখানেও তোমার ফুল রাইট আছে। এখন বলো, তুমি ফিফ্থ। প্রেফারেন্সে এক্সপ্লয়েট করবে নাকি। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে ইমতিয়াজ। ইশতিয়াকের মুখ চোখ রক্তিম হয়ে ওঠে। লজ্জা পায়। বিয়ে, এতো কম বয়সে! ইশতিয়াক আমতা আমতা করে বলে।

যাকে ইচ্ছে তাকে বিয়ে নয়, খুরশীদ মনে করিয়ে দেয়। সুযোগ খুঁজে বিয়ে। মেয়েটি আমেরিকান সিটিজেন হতে হবে। জানো কাউকে? পছন্দ হয়েছে? ভেবেছো কিছু? অনেকগুলো প্রশ্ন তীরের মতো বেরিয়ে আসে।

না আঙ্কেল, ওসব ভেবে তো কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশিনি। টেনিস খেলেছি, পিকনিকে গেছি, মাঝে মাঝে পার্টি করেছি। টেলিফোনে কথা বলেছি। এমন অনেক মেয়েই তো আছে।

তবে লেট আজ সী। ভেবে দেখি কে কে তোমার ক্যাণ্ডিডেট হতে পারে। উৎসাহ ঝলকে ওঠে খুরশীদের! রাহেলা, রুমারার মেয়ে না? ওর বয়স কম। ষোল বা পনেরো। তোমার কতো? ছাব্বিশ, দশ এগারো বছরের ডিফারেন্স। না, বড় বেশি, ওতে হবে না।

রাহেলার কথাও কাটা কাটা, ছুরির মতো ধার। ইশতিয়াক মন্তব্য করে।

বাপের স্বভাব পেয়েছে, খুরশীদ বলে। কিন্তু মন ভালো। দেখি আর কোন্ মেয়ে আছে এখানে। হ্যাঁ, মনে হয়েছে। উম্মেহানী, আজমেরীর মেয়ে। নিউ হ্যাভেনে পড়াশোনা করছে। দেখেছো তাকে? মাঝে মাঝেই তো আসে ওয়াশিংটনে।

কথাটা শুনে ইশতিয়াকের হার্টটা হঠাৎ জোরে চলতে থাকে। দেখেছে মানে? অনেকবার কাছে আসতে চেয়েছে উম্মেহানী। ইশতিয়াক নিজেই পাত্তা দেয়নি। মেয়েটির মাছে কেমন যেন আদেখলামি ভাব রয়েছে। কথা বলে টেনে টেনে। সবসময় ভালো লাগে না। ইশতিয়াক চুপ থাকে।

উম্মেহানী তো মেয়ে ভালোই হবে। বয়স কতো? একুশ বাইশ, ইকনমিক্সে পড়ছে। ব্রিলিয়ান্ট। তোমার মতোই। আর স্বভাবচরিত্রও ভালো। কি, কথা বলছো না কেন? খুরশীদ স্পষ্ট করেই জানতে চায়।

ওর কথা কখনো ভেবে দেখিনি আঙ্কেল। ইশতিয়াক স্বীকার করে।

ভাবোনি। কি আছে, এখন ভাবো। একটা স্ট্রাটেজী বের করো কোর্টশীপের। আজকাল তো প্রস্তাব দিয়ে বিয়ে হয় না। মেয়েরও মত চাই, ছেলেমেয়ের দেখাশোনা হওয়া চাই। খুরশীদ ভাবতে থাকে। ক্রিস্টমাসের ছুটিতে এসেছিলো। দেখা হয়েছে?

ইশতিয়াক মাথা নাড়ে। দেখা করতে চায়নি বলেই তো যায়নি আহমেদ নজীরের বাসায় ওদের পার্টিতে। সে কথা আঙ্কেলকে বলা যায় না।

ন্যান্সি। ইন্টারকমে খুরশীদ ডাকে। একটু আজমেরীকে দাও তো, কথা বলবো।

খুরশীদ অপেক্ষা করে। আশ্বস্তি দেয়। তুমি কিছুই ভবো না ইশতিয়াক, আমি নিজেই ম্যানেজ করে নেবো। নিশ্চিত থাকো।

একটু পরেই ন্যান্সি ইন্টারকমে বলে, মিসেস আজমেরী নজীর ওপাশে অপেক্ষা করছেন।

হ্যালো হ্যালো, আজমেরীর গলা ভেসে আসে, আমি আজমেরী বলছি।

আমি খুরশীদ বলছি। ভালো আছেন।

আছি। কি ব্যাপার। এতো সকালে ফোন করেছেন কেন খুরশীদ ভাই। কোনো তাগাদা নেই তো? আজমেরী জিজ্ঞেস করে।

আমি কি শুধু তাগাদা দেই?

তা'ছাড়া আর কি! আপনিশুধু হুকুমের মালিক। অনুযোগ করে আজমেরী। তা এতোবার হুকুম না করে আসুন না একবার বউকে নিয়ে বেড়াতে। না হয় একটু দূরেই থাকি।

আসবো, আসবো, উম্মেহানী কোথায়? ওকে আমার ভীষণ দরকার।

ওমা, ওতো কাল রাতে নিউ হ্যাভেনে চলে গেছে। ওখানেই পড়ছে তো। কি আশ্চর্য, খুরশীদ বলে, আমার যে ভীষণ জরুরী কথা ছিলো। আবার কবে আসবে?

কি জানি! আজমেরী বলে। ওর মুড্। ইচ্ছে হলে দশ-বার দিনে একবার বাপকে দেখতে চলে আসবে। আবার ইচ্ছে হলে মাস তিনেক চুপচাপ থাকবে। মোটেই আসবে না।

না, না, তিনমাস অপেক্ষা করা যাবে না। ওকে আমার দরকার আগেই।

কি দরকার বলুন তো আমায়, আমি টেলিফোন করবো। আজমেরী উৎসুক হয়।

ওকে এবারের একুশে ফেব্রুয়ারিতে সোলো গাইতে হবে।

বেশ তো গাইবে, সে তো অনেক দেরি। আজ মাত্র পাঁচই জানুয়ারী। আজমেরী জানায়। অতো তাড়া কিসের?

না, না, এবার কিছু রিহার্সেল দিতে হবে। স্প্রিপ্ট লিখছে ইশতিয়াক। ওর নিজের কথায়, নিজের গানে। সুর দেবো আমরা। সেই সুরে গাইতে হবে। খুরশীদ কারণ দেখায়।

সে অনেক ঝামেলা খুরশীদ ভাই। অতো সময় উম্মেহানী দিতে পারবে না। পড়াশোনায় গ্রেড কম হলে নজীর খুব রেগে যাবে কিন্তু।

না, না। খুরশীদ বলে, উম্মেহানীকে এবার গাইতেই হবে। দুটো বিকেল